এশিয়া-প্যাসিফিক শান্তি সম্মেলন - উদ্বোধন অনুষ্ঠান

ভাষণ

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী

শেখ হাসিনা

ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তন, শনিবার, ২১ জ্যৈষ্ঠ ১৪১৮, ০৪ জুন ২০১১

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

সহকর্মীবৃন্দ,

কূটনৈতিকবর্গ

দেশ-বিদেশের সম্মানিত অতিথিবর্গ,

সুধিমন্ডলী

আসসালামু আলাইকুম এবং শুভ সকাল।

দু'দিনব্যাপী এশিয়া-প্যাসিফিক শান্তি সম্মেলনে উপস্থিত সকলকে আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি।

আমি শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করছি সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে। যিনি শান্তির জন্য মর্যাদাপূর্ণ 'জুলিও কুরি' শান্তি পুরস্কারে ভূষিত হয়েছিলেন।

আমি স্মরণ করছি মুক্তিযুদ্ধের ৩০ লাখ শহীদ এবং ২ লাখ নির্যাতিত মা-বোনকে।

স্বাধীনতা এবং শান্তির জন্য বাঙালি জাতি যত রক্ত দিয়েছে, পৃথিবীতে আর কোন জাতিকে এত রক্ত ঝরাতে হয়নি।

এজন্যই স্বাধীনতার পর জাতির জনকের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে দেশের যে সংবিধান প্রণয়ন করা হয়, তাতে অভ্যন্তরীণ এবং বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে সুস্পষ্ট এবং জোরালো অঙ্গীকার ব্যক্ত করা হয়।

আমাদের সংবিধানের ২৫ নম্বর অনুচ্ছেদে আছে: ''জাতীয় সার্বভৌমত্ব ও সমতার প্রতি শ্রদ্ধা, অন্যান্য রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ না করা, আন্তর্জাতিক বিরোধের শান্তিপূর্ণ সমাধান এবং আন্তর্জাতিক আইনের ও জাতিসংঘের সনদে বর্ণিত নীতিসমূহের প্রতি শ্রদ্ধা - এই সকল নীতি হইবে রাষ্ট্রের আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ভিত্তি।"

পবিত্র সংবিধানের আলোকে আমরা সব সময়ই সাম্রাজ্যবাদ, ঔপনিবেশিকতাবাদ বা বর্ণবৈষম্যবাদের বিরুদ্ধে সোচ্চার থেকেছি। বিশ্বের সর্বত্র নিপীড়িত মানুষের ন্যায়সঙ্গত অধিকার আদায়ের সংগ্রামকে সমর্থন দিয়েছি।

রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের মাধ্যমে স্বাধীন বাংলাদেশ ১৯৭৩ সালে জোট নিরপেক্ষ আন্দোলনে যোগ দেয়। ১৯৭৪ সালে লাভ করে জাতিসংঘের ১৩৬তম সদস্যপদ। জাতিসংঘের সদস্য রাষ্ট্র পদ লাভ করার পর পরই জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ২৯তম সাধারণ অধিবেশনে মাতৃভাষা বাংলায় ভাষণ দেন। বঙ্গবন্ধুর সে ভাষণের অনেকটা জুড়েই ছিল বিশ্বে শান্তি প্রতিষ্ঠার প্রতিশ্রুতি।

তিনি বলেন, শান্তির বিশ্ব গড়ে তোলার জন্য বাঙালি জাতি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রাম ছিল শান্তি ও ন্যায়ের সংগ্রাম। জাতিসংঘ ২৫ বছরে ধরে এই শান্তি ও ন্যায়ের জন্যই সংগ্রাম করে যাচ্ছে।

গুটি কয়েক লোকের অপ্রত্যাশিত সুখ-সমৃদ্ধির পাশাপাশি বিপুল জনগোষ্ঠীর দুঃখ-দুর্দশার কথা বিশ্ব সমাজের তুলে ধরেছিলেন বঙ্গবন্ধু।

জাতিসংঘের সদস্যপদ লাভের প্রায় ৩৬ বছর অতিক্রান্ত হয়েছে। বাংলাদেশ এ দীর্ঘ পথ পরিক্রমায় সবসময়ই শান্তির পক্ষে কাজ করেছে। বর্তমানে জাতিসংঘ শান্তি রক্ষা মিশনে বাংলাদেশ সর্বোচ্চ সংখ্যক শান্তিরক্ষী প্রেরণকারী দেশ। বিশ্বের বিভিন্নপ্রান্তে শান্তি রক্ষা করতে গিয়ে আমাদের এ পর্যন্ত ১০৩ জন শান্তিরক্ষী শহীদ হয়েছেন।

সুধিবৃন্দ,

আমরা বিশ্বাস করি শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে নয়, আলোচনা ও সমঝোতার মাধ্যমেই অভ্যন্তরীণ এবং আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে শান্তি প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব।

সে কারণেই প্রধানমন্ত্রী হিসেবে আমি গত মেয়াদে ১৯৯৬ সালে সরকারের দায়িত্ব নিয়েই পার্বত্য চট্রগ্রামের ৩০ বছরের জাতিগত সংঘাত নিরসনের উদ্যোগ গ্রহণ করি। যার ফলশ্রুতিতে ১৯৯৭ সালের ২রা ডিসেম্বর ঐতিহাসিক পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। দেশে-বিদেশে এই শান্তি চুক্তি বিপুলভাবে প্রশংসিত হয়।

এই চুক্তি স্বাক্ষরের পর ৫০ হাজারেরও অধিক শরণার্থীকে দেশে ফেরত এনে আমরা পুনর্বাসিত করি। শান্তিবাহিনীর সশস্ত্র সদস্যরা অস্ত্র জমা দিয়ে স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসে। তাঁদের অনেককে সরকারি চাকুরি দেওয়া হয়।

১৯৯৭ সালে স্বাক্ষরিত শান্তি চুক্তির ফলশ্রুতিতে পার্বত্য চট্টগ্রামে আজ স্বাভাবিক অবস্থা বিরাজ করছে। সেখানকার জনগণের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন হচ্ছে।

গণতন্ত্র, সর্বজনীন মানবাধিকার এবং শান্তি প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে আমি ব্যক্তিগতভাবে সব সময়ই সচেষ্ট থেকেছি।

১৯৯৮ প্রতিবেশি ভারত ও পাকিস্তান পারমাণবিক বিস্ফোরণ ঘটালে এ উপমহাদেশে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। ব্যক্তিগত উদ্যোগে আমি সে সময় ভারত ও পাকিস্তান সফর করি এবং এ দুই দেশের মধ্যে উত্তেজনা প্রশমণে সামান্য হলেও ভূমিকা পালন করি।

সুধিবৃন্দ,

দারিদ্র্য ও শান্তির সহাবস্থান সম্ভব নয়। আমি মনে করি দারিদ্র্য মানবতার সবচেয়ে বড় শত্রু। শান্তির জন্য চাই মানুষের ন্যূনতম মৌলিক চাহিদা পূরণ। মানুষকে দারিদ্র্যের বেড়াজাল থেকে মুক্ত করা। পাশাপাশি মৌলিক অধিকার, গণতন্ত্র, আইনের শাসন ও মানবাধিকার প্রতিষ্ঠা করা।

আমরা সেজন্যই দারিদ্র্য বিমোচনকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিয়েছি। আমাদের সকল উন্নয়ন কর্মকান্ডের মূল লক্ষ্য হচ্ছে দারিদ্র্য বিমোচনের মাধ্যমে সাধারণ মানুষের মৌলিক অধিকার পূরণ করা।

এজন্য দারিদ্র্য হ্রাসে আমরা ৮২টি খাতে সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছি। আমরা কৃষি উন্নয়ন এবং গ্রামীণ কর্মসংস্থান সৃজনকে অগ্রাধিকার দিচ্ছি।

অবহেলিত জনগোষ্ঠী বিশেষ করে নারী, শিশু এবং প্রতিবন্ধীদের জন্য আমরা বিশেষ কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছি। সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যসমূহ অর্জনে বাস্তবসম্মত পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে।

শিশুমৃত্যু হার হ্রাসের সাফল্যের জন্য আমরা ইতোমধ্যেই এমডিজি-৪ পুরস্কার পেয়েছি। তবে, বাংলাদেশের মত জনবহুল এবং অনুন্নত দেশের পক্ষে এমডিজির লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করা এককভাবে সম্ভব নয়। এজন্য বিশ্ব সম্প্রদায়ের এগিয়ে আসতে হবে। বাড়াতে হবে পারস্পরিক সহযোগিতার হাত।

আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা না হলে শান্তি প্রতিষ্ঠা সম্ভব নয়। ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের সময় যারা মানবতা বিরোধী অপরাধ করেছিল, তাদেরকে প্রচলিত আইনে বিচারের আওতায় আনা হচ্ছে।

১৯৭৫ সালে জাতির পিতাকে সপরিবারে হত্যাকারীদের বিচার প্রচলিত আইনে সম্পন্ন করে ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। ৩৪ বছর পর বাঙালি জাতি হয়েছে কলঙ্কমুক্ত।

এশিয়া-প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের মানুষের প্রকৃত উন্নয়নের জন্য পারস্পরিক সহাবস্থান এবং সমৃদ্ধির ক্ষেত্রে আমাদের ঐক্যবদ্ধ হতে হবে। সহযোগিতার মনোভাব নিয়ে এগুতে হবে।

আমরা যদি পরস্পরের দিকে সহযোগিতার হাত বাড়াই, নিম্ন আয়ের প্রতিবেশী দেশগুলোর দিকে দৃষ্টি দেই, তাহলে অবশ্যই এ অঞ্চলের অর্থনৈতিক মুক্তি আসবে। এ লক্ষ্য অর্জন করতে পারলে সবার জন্য সমৃদ্ধ ভবিষ্যৎ নিশ্চিত হবে। শান্তি দীর্ঘস্থায়ী হবে।

সুধিবৃন্দ,

আজ বিশ্বের অনেক দেশ ‘মারণাস্ত্র 'এবং ‘মানব বিধ্বংসী অস্ত্র' উৎপাদন করার জন্য হাজার হাজার কোটি ডলার ব্যয় করছে। যেখানে উন্নয়নশীল দেশের লক্ষ লক্ষ মানুষ চরম দারিদ্রের মধ্যে দিন কাটাচ্ছে, সেখানে সত্যিই এটি একটি নিষ্ঠুর পরিহাস।

এই ধ্বংসাত্মক অস্ত্রের পিছনে ব্যয় সামান্য কমালে বিশ্বের প্রায় ৯০ কোটি দরিদ্র মানুষের জীবনমানের উন্নয়ন সম্ভব।

বস্তুতঃপক্ষে যেখানে অনেক দেশ অস্ত্র উৎপাদনে বিশাল অঙ্কের অর্থ ব্যয় করছে, সেখানে আমরা গুটিকয়েক দেশ দারিদ্র্য বিমোচন, মানবসম্পদ উন্নয়ন এবং দরিদ্র মানুষের ক্ষমতায়নে হিমশিম খাচ্ছি। এসব মানব বিধ্বংসী অস্ত্রের বিস্তার রোধে আমাদের একযোগে কাজ করতে হবে। শান্তিকামী মানুষকে আরও সোচ্চার হতে হবে।

মৌলবাদ, জঙ্গিবাদ এবং সন্ত্রাসবাদ বর্তমান বিশ্বের জন্য এক মারাত্মক হুমকি হয়ে দেখা দিয়েছে। অনেক সময় দারিদ্র্য ও বঞ্চনা থেকে এসব সন্ত্রাসবাদের উন্মেষ ঘটে। এজন্য আমাদের একদিকে দারিদ্র্য ও বঞ্চনা যেমন দূর করতে হবে, তেমনি সন্ত্রাসবাদকে কঠোর হস্তে নির্মুল করতে হবে। এখানে আপোসের কোন সুযোগ নেই।

তবে কোন একক দেশের পক্ষে এসব সন্ত্রাসী কর্মকান্ড মোকাবিলা করা সম্ভব নয়। এজন্য সম্মিলিত উদ্যোগ প্রয়োজন।

বাংলাদেশে ব্যক্তিগভাবে আমি নিজে এবং আমার দলের নেতা-কর্মীরা বারবার এসব সন্ত্রাসী কর্মকান্ডের শিকার হয়েছি। সেজন্য বাংলাদেশের মাটিকে আমরা কোনভাবেই সন্ত্রাসী কর্মকান্ডের জন্য ব্যবহৃত হতে না দিতে বদ্ধপরিকর।

সুধিবৃন্দ,

এ সম্মেলন থেকে আমি বিশ্বের বিবদমান দেশ, জাতি ও গোষ্ঠীর সকল শান্তিকামী জনগণকে সমঝোতা ও সহনশীলতার ধারাকে এগিয়ে নেওয়ার আহবান জানাচ্ছি।

আমরা বিশ্বে রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা, অর্থনৈতিক ও সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার পক্ষে। যেখানে মানবাধিকার ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য অক্ষুণ্ণ থাকবে।

অন্যায়, অবিচার ও বঞ্চনার শিকার, অভিবাসী, শরণার্থী, স্থানচ্যুত, প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর সাহায্যে আমি সবাইকে ঐক্যবদ্ধভাবে এগিয়ে আসার আহবান জানাচ্ছি।

অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে বিশ্বব্যাপী যোগাযোগ ব্যবস্থা গড়ে তুলতে হবে। তথ্য ও জ্ঞানের অবাধ প্রবাহ নিশ্চিত করতে ডিজিটাল প্রযুক্তির ব্যবহারকে উৎসাহিত করতে হবে।

সকলকে সন্ত্রাস, সহিংসতা ও আগ্রাসনের পথ পরিহার করতে হবে। বিশ্বব্যাপী জনগণের মৌলিক অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে হবে। এ জন্য সত্য, ন্যায় ও গণতান্ত্রিক চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে বিবদমান সমস্যা ও বিরোধগুলোর মিমাংসা করতে হবে।

সম্মানিত ডেলিগেটবৃন্দ,

এ সংঘাতপূর্ণ বিশ্বে শান্তি প্রতিষ্ঠায় আপনারা নিরলসভাবে কাজ করছেন। আপনাদের এ প্রচেষ্টাকে আমি অভিনন্দন জানাই। আমি আশা করি আগামী দু'দিনে পারস্পরিক আলোচনা এবং মত বিনিময়ের মাধ্যমে বিশ্ব শান্তি প্রতিষ্ঠায় আপনারা একটি লাগসই কর্মপরিকল্পনা প্রণয়নে সক্ষম হবেন।

এ সম্মেলনে অংশগ্রহণকারী বিদেশী অতিথিদের স্বাগত জানাচ্ছি। আমি আশা করি আপনাদের অবস্থান আনন্দদায়ক হবে।

সুধিবৃন্দ,

আমরা শান্তির পক্ষে। তাই বিশ্ব শান্তি প্রতিষ্ঠায় আমাদের সামর্থ্য অনুযায়ী অবদান রাখতে আমরা বদ্ধপরিকর। আমাদের জাতির পিতার স্বপ্ন ছিল একটি ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত, প্রগতিশীল, অসাম্প্রদায়িক ও শান্তিপূর্ণ 'সোনার বাংলা' প্রতিষ্ঠা করা।

জাতির পিতার আদর্শকে পাথেয় করে আমরা বাংলাদেশকে এ অঞ্চলের সবচেয়ে শান্তিপূর্ণ দেশ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে চাই। বিশ্বের শান্তিকামী মানুষেরা নিয়শ্চয়ই আমাদের এ অভিযাত্রায় সহযাত্রী হবেন।

বিশ্বের সকল মানুষের কল্যাণ ও শান্তি কামনা করে আমি দু-দিনব্যাপী এশিয়া-প্যাসিফিক শান্তি সম্মেলনের শুভ উদ্বোধন ঘোষণা করছি।

খোদা হাফেজ।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু।

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

.....